ISSN: 2584- 0738 (Online)
Criticality
Vol. 01, No. 02, December 2023, pp. 63-75
Activism Foundation
for Social Research & Action

স্ব মর্যাদার সন্ধানে পেরিয়ারঃ[1]

দেবী চ্যাটার্জি [2]

প্রান্তিক মানুষের লড়াই পশ্চিমবঙ্গে পেরিয়ারের নামটা অল্প পরিচিত। বাংলার অধিকাংশ মানুষ তাঁর নাম শোনেনই নি; যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের ধারণাও ভাসাভাসা, অস্পষ্ট। তাঁরা তাঁকে বড়জোর একজন দক্ষিণ ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন আর বাংলার মানুষের কাছে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বলেই যেন দূরে ঠেলে দেন অগ্রাহ্য করেন। সেই পেরিয়ারের কথাই এখানে আলোচনা করি কারণ তিনি সচরাচর আলোচনায় না এলেও আলোচনার দাবী রাখেন। তাঁর চিন্তা, ভাবনা,আন্দোলন শুধু দক্ষিণ ভারত নয়, সারা ভারতের পক্ষেই আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতের মূল ধারার চিন্তার থেকে দূরে যে বিকল্প চিন্তার স্রোত দীর্ঘ কাল ধরে বিকশিত হয়ে এসেছে, প্রান্তিক মানুষের আশা ভরসার কেন্দ্র থেকেছে, সেটাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে পেরিয়ারের চিন্তাভাবনা। ফলে তাঁকে আরো একটু কাছ থেকে দেখা যাক। জানা যাক তিনি কে ছিলেন, কি চেয়েছিলেন, কি বলেছেন । দেখা যাক তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে।

পেরিয়ারের কর্মকান্ডের পটভূমিঃ জাতি বিভক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ

প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু সমাজ জাতি বিভক্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদী এই সমাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেলেও তার জাতি বিন্যাস পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হয়েও শক্তপোক্ত ভাবেই বহাল থেকে গেছে। ফলে এক দিকে যেমন সুবিধাভোগী এক শ্রেণী গড়ে ওঠে, তেমনই অন্য দিকে সমাজের প্রান্তে পড়ে থাকে ‘অপবিত্র’ চিহ্নিত অস্পৃশ্য নীচু জাতির মানুষ। এই দুই প্রান্তের মাঝে ধাপে ধাপে সাজানো থাকে ‘পবিত্রতা’ ‘অপবিত্রতার’ নিরিখে নানা জাতিগোষ্ঠী। সেই মানদন্ডের নিরিখে উপর দিকে যেমন থাকে ব্রাহ্মণদের নিচেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতিগুলি, নিচের

[1] Invited article; it was published earlier in *Samaj jigyasa,* 2020, No 1 & 2.
[2] Former Professor, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata, WB, INDIA.

দিকে 'অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎদের ওপরের থাকে অগণিত শুদ্র জাতি সমূহ। জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় মানুষের কোন কিছু পাওয়া না পাওয়ার সামাজিক অধিকার। সুযোগ সুবিধে, সন্মান সবই কুক্ষিগত থাকে সমাজের জাতি পরিচয়ে উপর তলার মানুষের হাতে। প্রান্তিক নিচের তলার মানুষ চির বঞ্চিত থাকে। উঁচু জাতির বা বর্ণ হিন্দু মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে এসেছে। এক দিকে যেমন নীচু জাতিদের শিক্ষার অধিকারকে নানা ভাবে সঙ্কুচিত করেছে, অন্য দিকে তাদের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে তাদের সংস্কৃতিহীন, অসভ্য মানুষ বলে চিহ্নিত করে ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কৃতিকে একমাত্র গ্রহণীয় সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের এই কূট চাল ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে মানুষের উপর চাপানো হয়েছে। অধিকাংশ ধর্মভীরু মানুষ তা মেনে নিয়েছে। তবে সবাই নয়। প্রতিবাদ উঠেছে নানা সময়, নানা দিক থেকে। কখন প্রতিবাদ ধর্মীয় আকার নিয়েছে, কখন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক। সেই প্রতিবাদী ধারা বহণ করেছে বিকল্প সংস্কৃতির চেতনা। এক অন্য সংস্কৃতি অব্রাহ্মণ সংস্কৃতি। সেই অব্রাহ্মণ সংস্কৃতি প্রান্তিক মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সে বিকল্প সংস্কৃতির ধারা দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা করেছে। প্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত চেতনার হাত ধরে, মধ্য যুগে ভক্তি আন্দোলনের পথ বেয়ে, কবীরের দোঁহার ভিতর দিয়ে বাউলদের গানের কলিতে সে সংস্কৃতি নিজের অস্তিত্বের কথা বারবার ঘোষণা করে গেছে। সে সংস্কৃতির অস্তিত্ব দেখা যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে , প্রত্যন্ত গ্রামে, গ্রাম দেবতাদের উপাসনার রীতি রেওয়াজের মধ্যে।[1] আধুনিক ভারতে এই প্রতিবাদী ধারা বহনকারী অন্যতম সেনানী পেরিয়ারের কথাতে এবার আমরা আসি।

কে এই পেরিয়ার?

যাঁকে সংক্ষেপে ই ভি আর ই ভি রামসামী নাইকার , বা ঈরোড ভেঙ্কাটাপ্পা রামসামী নাইকার বলা হয়, তিনিই পেরিয়ার নামে খ্যাত। নাইকার পদবী জাতি-চিহ্ন বাহক হওয়ায় জীবনে একটা সময়ে তিনি সেটিকে পরিত্যাগ করে তাঁর নাম শুধু ই ভি রামসামী হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি 'রামস্বামী' নয়, 'রামসামী' ব্যবহার করতেন। সেটার একটা যুক্তি ছিল। 'স্বামী' বর্ণহিন্দুদের সংস্কৃত ভিত্তিক শব্দ, তাই সেটাকে তিনি তাঁর নামে 'সামি' তে রুপান্তরিত করেন। 'পেরিয়ার' হল ই ভি আর-কে তাঁর অনুগামীদের দেওয়া উপাধি। এই উপাধির অর্থ তামিল ভাষায় 'পেরিয়া যার', অর্থাৎ 'বড় মানুষ'। ১৯৩৮-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত মহিলাদের একটি সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করে রামসামীকে 'পেরিয়ার' উপাধি প্রদান করে। সেই থেকে তিনি পেরিয়ার নামে পরিচিত। ১৮৭৯ – এ, ১৭ সেপ্টেম্বর, রামসামীর জন্ম হয় দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ঈরোড নামক শহরে। তিনি ছিলেন চার ভাই বোনের মধ্যে একজন। তাঁদের পরিবারটি ছিল কন্নাডিগা বালিজা নাইডু জাতির অব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্বচ্ছল পরিবার। পিতার নাম ভেঙ্কাটাপ্পা নাইকার মা চিন্নাথায়াম্মাই। ই ভি আর-এর নিজের কথায়, তিনি তাঁর বাবাকে ঈরোড মিউনিসিপ্যালিটির

চেয়ারম্যান হিসাবে দেখেছিলেন এবং তিনি প্রতি বছর সফল ব্যবসায়ী হিসাবে সরকারকে একশ থেকে একশ পঞ্চাশ টাকা কর দিতেন।[2] অব্রাহ্মণ পরিবারের এই বাড়িতে নিয়মিত নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সাধু সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করত। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত হত। এ ছাড়াও তাঁর পরিবার ঈরোডে বিভিন্ন উৎসব ও মন্দির সংস্কারের পিছনে বিপূল অর্থ ব্যয় করত।[3] এ সব করায় ই ভি আরের পরিবারের সেই এলাকায় ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং হিন্দু ধর্মের সেবক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ই ভি আর নিজে কিন্তু সেই পথে হাটেন না। কিশোর বয়স থেকেই তিনি প্রতিবাদী চরিত্রের পরিচয় দিতে থাকেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর বাবা, মা এবং শিক্ষকদের নির্দেশ অমান্য করে তিনি নীচু জাতের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন, এমন কি জলও খেতেন। দুরন্ত ছেলে রামসামীর লেখাপড়ায় কোন মন ছিল না। স্কুলের লেখাপড়া সর্বমোট পাঁচ ছয় বছর করেন, তারপর বারো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি পড়াশুনায় ইতি টেনে দিয়ে কিছু দিন পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, আবার তার পর কিছু দিন সাধুসন্তের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। উনিশ বছর বয়সে ইভি আর নাগাম্মাইকে বিবাহ করেন। তিনি নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে, ভি আরের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ।ই ভি আরের ধণী পিতা মাতা খুশি না হলেও মত দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সময় থেকে ইভি আর যেন সামাজিক নিয়ম নীতির আরো বিরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে তাঁকে মন্দিরে যাওয়া আসা থেকে বিরত করেন; এবং তাঁর কন্ঠের বৈবাহিক চিহ্ন থালিটিকে, খুলিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। এই ভাবেই ই ভি আর তাঁর স্ত্রীকে সামাজিক নিয়ম কানুন ভেঙ্গে অযৌক্তিক দাসত্বের চিহ্নগুলি থেকে মুক্ত করেন। পরবর্তী জীবনের নারী মুক্তির জন্য তিনি বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান।[4] বলা বাহুল্য, রামসামীর ব্যতিক্রমি চিন্তা ভাবনার ফলে তাঁর বাবা মার সঙ্গে তাঁর অশান্তি প্রায়ই লেগে থাকত। এক সময়, পঁচিশ বছর বয়সে বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেনারস চলে যান। সেখানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করেন সাধু সন্তদের সংস্পর্শে আসেন। সেখানে দেখেন নীচু জাতিদের প্রতি সাধু সন্তের অমানবিক আচরণ। ইতিমধ্যেই রামসামী হিন্দু শাস্ত্রের ত্রুটি, দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বেনারসের অভিজ্ঞতা তাঁকে আরো বেশী ধর্ম ও ঐতিহ্য বিরোধী করে তোলে। ১৯০৪-এ ই ভি আর বেনারস থেকে ফিরে আসেন। ১৯১৪ থেকে ঈরোড ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দেন। ১৯২০-তে গিয়ে কংগ্রেসের সদস্য হন।[5] তাঁর সেই সময়ের ও পরবর্তী কর্মকান্ডের কথায় এবার আসা যাক।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ ও বিচ্ছেদ

স্কুলে পড়তে পড়তেই কম বয়সেই রামসামী অল্পবিস্তর রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তবে, ১৯১৯-১৯২০-র আগে তিনি কোন বড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন নি। জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ডের পর কংগ্রেস সদস্য হন। কংগ্রেসে যোগদানের পর, গান্ধীর নীতিগুলি ই ভি আর

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করেন। মিলের এবং বিদেশি কাপড়ের ব্যবহার বর্জন করেন, এবং খাদির ব্যবহার শুরু করেন। এমন কি তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদের এই ব্যাপারে প্রভাবিত করতেও সক্ষম হন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি তামিল নাড়ুর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে খাদির প্রচার চালান। প্রচারের ফলে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি খাদির দোকানও খুলে যায়। আগে একই দোকান থেকে মিলের কাপড়, বিদেশি কাপড় আর খাদির কাপড় বিক্রি হত। এবার খুলল পৃথক খাদির দোকান। এর ফলে খাদির বিক্রিও বেশ অনেকটাই বেড়ে গেল।[6] ই ভি আর খাদির প্রচারে শুধু বক্তৃতা দিয়েই থামেন নি। তিনি নিজে খাদির পোশাক নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষ জনকে তা কিনতে উৎসাহ দেন। কিন্তু একটা সময় তাঁর নিজের উৎসাহ কমে আসে, যখন তিনি বুঝতে পারেন যে খাদি বোর্ড-এর অধিকাংশ সদস্যই ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা একটি জাতির স্বার্থেই কাজ করে। তিনি বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামার কথাও ভাবেন, তবে গান্ধীর অনুরোধে তা থেকে বিরত হন। গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও ই ভি আর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নিজের পরিবারের নানা সরকারি নথি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন যার ফলে পরিবারের আনুমানিক আর্থিক ক্ষতি হয় পঞ্চাশ হাজার টাকার মত।[7] মাদক নিষিদ্ধকরণের দাবীতেও তিনি গান্ধীর অবস্থান গ্রহণ করেন, মিটিং, মিছিল করেন এবং মদের দোকানের সামনে ধর্নায় বসেন। এমনই একটি ধর্নার সময় তিনি তাঁর জীবনে প্রথম বার গ্রেপ্তার হন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯২৩-১৯২৪-এ ই ভি আর তামিল নাড়ুর কংগ্রেসের সভাপতি পদ পান। তবে কংগ্রেস রাজনীতি তাঁকে বেশিদিন আকর্ষণ করতে পারে না।

কুড়ির দশকের গোড়া থেকেই শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানে কমিউনাল প্রতিনিধিত্ব বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দুরত্ব বাড়তে থাকে। ১৯২০ থেকে ১৯২৪ এর মধ্যে তিনি এই বিষয়ে কংগ্রেসকে দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করানোর চেষ্টা চালান, কিন্তু ব্যর্থ হন। এই সময় থেকেই ই ভি আরের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটতে থাকে।[8] তিনি উপলব্ধি করেন সেই সময়ের কোন রাজনৈতিক দলই তাঁর লক্ষ্য পূরণে উপযুক্ত নয়। দেখলেন, সামাজিক স্তরে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণদের মধ্যের যে তীক্ষ্ণ বিভাজন ছিল তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। কংগ্রেসের মধ্যেও ঐ একই ছবি দেখেন। ই ভি আর সেটা মানতে নারাজ ছিলেন। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দুরত্ব বাড়তে থাকে।[9] ক্রমেই নীচু জাতিদের প্রতিনিধি হিসাবে রামসামীর পরিচিতির বিস্তার ঘটতে থাকে। সে পরিচিতি বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪-১৯২৫ এর ভাইক্কম সত্যাগ্রহে তাঁর দেওয়া নেতৃত্বের পর থেকে। ভাইক্কম সত্যাগ্রহ ছিল অস্পৃশ্য মানুষদের ট্র্যাভানকোরের ভাইক্কমে মহাদেব মন্দিরে যাওয়ার পথে হাঁটার অধিকারের জন্য সংগঠিত লড়াই। জাতীয় কংগ্রেস সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পুলিশি ধরপাকড় নেমে আসে। প্রথম সারির অনেক নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর, ই ভি আর এগিয়ে আসেন। কিন্তু গান্ধী ও কংগ্রেসের ভূমিকা ক্রমেই তাঁকে হতাশ করে। ভাইক্কম সত্যাগ্রহে ই ভি আর সেই সময়ে দেওয়া তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য জনগণের কাছে পরিচিত হন 'ভাইক্কম বীরর' বা 'ভাইক্কমের বীর' হিসাবে। এ দিকে ১৯২৫

থেকে শুরু হওয়া ‘স্ব মর্যাদা আন্দোলন’এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব গান্ধী এবং জাতীয় ও কংগ্রেসের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ই ভি আর সেই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকেন এবং তামিল নাড়ুতে সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আত্মনিয়োগ করেন । গান্ধী ও আরো কয়েকজন কংগ্রেস নেতা মিলে ই ভি আরকে মানানোর চেষ্টা চালান। সেই উদ্দেশ্যে ১৯২৭-এ বাঙ্গালোরে তাঁরা ই ভি আরের সঙ্গে আলোচনাতেও বসেন। তবে তাতে কোন কাজ হয় না। কংগ্রেস ও গান্ধীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। এক দিকে স্ব মর্যাদা আন্দোলন হিন্দু ধর্মের উপর আক্রমণ আরো জোড়ালো করে অন্য দিকে স্ব মর্যাদা আন্দোলন-এর উপর ব্রাহ্মণ জাতীয়তাবাদীরা ও হিন্দু প্রকাশনা সংস্থাগুলি তাদের ক্ষোভ উগরে দিতে থাকে। দেখা যায়, ১৯২৭-এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ই ভি আর-এর গান্ধী সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হন। তাঁর মনে হয়, কংগ্রেস ও গান্ধী তামিল নাড়ুতে ব্রাহ্মণদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি সামাজিক জাগরণের উদ্দেশ্যে ইতি মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ‘স্ব মর্যাদা আন্দোলন' অথবা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন' কে হাতিয়ার করে লড়াইকে আরো জোরাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ই ভি আর-এর কংগ্রেস ও গান্ধী প্রসঙ্গে মোহভঙ্গ হওয়ার পর সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের প্রভাবে এসে ১৯৩০-এর দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দিকে যেমন ঝোঁকেন, জাস্টিস্ পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের উত্থান পতনও আসে আত্ম মর্যাদা আন্দোলনের রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে। ১৯২৫ নভেম্বরে কাঞ্চিপুরমে অনুষ্ঠিত তামিল নাড়ু কংগ্রেস কমিটির সভা-ই ছিল ঐ ধরনের শেষ সভা যাতে পেরিয়ার উপস্থিত থেকেছিলেন। সেই সময় পর্যন্ত স্ব মর্যাদা আন্দোলনের কুডি আরাসু পত্রিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী, জাতি বিরোধী, অস্পৃশ্যতা বিরোধী এমন কি তামিল নাড়ু কংগ্রেস বিরোধী লেখাপত্র ছাপা হলেও, গান্ধী ও খাদির পক্ষে রচনাদি প্রকাশিত হত। কাঞ্চিপুরমের সম্মেলনের পর থেকে ই ভি আর এক দিকে জাস্টিস্ পার্টির সভা সমিতিতে যেতে লাগলেন, অন্য দিকে তামিল নাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে Self Respect League গঠনে ব্রতী হলেন।[10]

ই ভি আর ও ‘সুয়া মরিয়াদাই ইয়ন্ধম্

১৯২০র দশক থেকে ক্রমেই দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে পেরিয়ার হয়ে ওঠেন জোরালো কন্ঠ। তিনি তামিল সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তার পুষ্ট সংস্কৃতায়িত সংস্কৃতিকে দায়ী করেন। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই সংস্কৃতিকে সমূলে উপড়ে ফেলা, যাতে অসম্মানের পরিবর্তে সম্মান প্রতিষ্ঠা পায়, বৈষম্যের জায়গায় সাম্য। তামিল অঞ্চলে South Indian Liberal Federation বা জাস্টিস পার্টির হাত ধরে ১৯১৭ -য় অব্রাহ্মণ আন্দোলনের সূচনা হয়। তার নেত্রীত্বে ছিলেন টি চেট্টি, টি এম নাইয়ার প্রমূখ। তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল চতুর্মুখী। এক, অ-ব্রাহ্মণদের নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। দুই, তাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। তিন, তাদের এক হয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে সব সম্প্রদায়ের জন্য আইন কক্ষে ও প্রশাসনে আনুপাতিক

প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চার, নিজেদের যৌথ প্রচেষ্টায় এক বিশাল ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়তে হবে যাতে পরবর্তীকালে মানুষের জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম আর প্রাসঙ্গিক থাকবে না।[11] কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির পরে জাস্টিস পার্টির ঘনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, ক্রমে পেরিয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অন্য মাত্রা দেন। প্রমাণ করেন, অব্রাহ্মণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার শুধু জাস্টিস পার্টির নয়। গান্ধীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে, রামসামীর কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রবেশ হয়ে থাকলেও, তাঁর এক স্বতন্ত্র এজেন্ডা ছিল। সেটা ছিল শূদ্র মানুষের মঙ্গল সাধন। সেই এজেন্ডাই তাঁকে কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদের মুখে এনে দাড় করায় নিয়ে যায় তাঁকে তাঁর নিজস্ব লড়াইয়ের পথে। কংগ্রেসে থাকতে থাকতেই তিনি যুক্ত হন 'সুয়া মরিয়াদাই ইয়ক্কম' বা Self Respect Movement এর সঙ্গে। বাংলায় যাকে বলা চলে 'স্ব মর্যাদা আন্দোলন' অথবা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'। এ আন্দোলনকে সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন বলা চলে। এটা মূলত সামাজিক আন্দোলন হলেও, এর ব্যাপ্তি ছিল এতই বিশাল যে তা তৎকালীন তামিল অঞ্চলের সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। পেরিয়ার তামিল নাড়ুতে 'স্ব মর্যাদা আন্দোলন' এর সূচনা করেন ১৯২৫। এটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে একটি অন্য বিকল্প সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে এটি তামিল নাড়ুতে একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন হিসাবে উঠে আসে। ই ভি রামসামী পাঁচটি মূল নীতির ওপর দাঁড় করিয়ে এই আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। এগুলি হলঃ

১। ভগবানের ধারণাকে মুছে ফেলতে হবে;

২। ধর্মের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে;

৩। কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে হবে;

৪। গান্ধিবাদকে বিলুপ্ত করতে হবে;

৫। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিনাশ করতে হবে।

নীতিগুলির দিকে তাকালেই দেখা যায় এগুলি এক দিকে যেমন সামাজিক, অন্য দিকে রাজনৈতিক। পেরিয়ার কংগ্রেস এবং গান্ধীকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিনিধি হিসাবেই দেখেন এবং তাদের বিরোধিতা করেন। তবে শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদ নয়, ধর্ম মাত্রই যুক্তিবাদী পেরিয়ারের আক্রমণের মুখে পড়ে। তিনি লড়াই করেন এক যুক্তিবাদী, ধর্ম-বিশ্বাস মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে। এই স্ব মর্যাদা আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন ১৯২৯-এ চেঙ্গালপাটু-তে অনুষ্ঠিত হয়। ছ হাজারের বেশি মানুষ সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই দূর দুরান্ত থেকে এসেছিলেন। সেখানে খাবার রান্না করেন ও পরিবেশন করেন নীচু নাডার জাতির লোকেরা। সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহিত হয় তাতে বলা হয়,

১। বর্ণাশ্রমের নামে মানুষের উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা সব তুলে দিতে হবে; সমাজের জাতি ভিত্তিক বিভাজন অত্যন্ত আপত্তিকর এবং বাতিল করতে হবে; অস্পৃশ্যতা মানব সভ্যতা ও জাতীয় অগ্রগতির পথে বাধা, তার অবসান ঘটাতে হবে; সব মানুষের সব রাস্তা দিয়ে হাঁটার এবং

সব জলাশয় ব্যবহারের অধিকার থাকা উচিত। কোন ব্যক্তির জাতিগত চিহ্ন কপালে বা দেহে ধারণ করা উচিত নয়।

২। লোকের মন্দিরে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয় এবং পূজারীদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। পুরোহিত ব্যবস্থার বিলুপ্তি প্রয়োজন। উপাসনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অথবা উত্তর ভারতীয় অন্য কোন ভাষার ব্যবহার বর্জনীয়। লোককে নতুন করে মন্দির, মঠ প্রভৃতি স্থাপন করা থেকে নিরুৎসাহ করা উচিত; নামের সঙ্গে জাতিগত পদবি বর্জনীয়। সাধারণের অর্থ ব্যয় হওয়া উচিত শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষে। 'স্ব মর্যাদা আন্দোলন এর পরবর্তী সম্মেলন হয় ঈরোড-এ। সেখানে আরো জোরালো ভাষায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং মন্দিরে মুর্তি পুজার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ১৯৩১-এ স্ব মর্যাদা আন্দোলনের তৃতীয় ভিরুধানগর-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আগের গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি, ভিন্ন জাতির পাত্র পাত্রীদের মধ্যে বিবাহকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়।[12] স্ব মর্যাদা আন্দোলনকে পেরিয়ার সামাজিক আন্দোলন হিসাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেও তা অল্প দিনেই রাজনৈতিক এজেন্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতি বিভাজনহীন, ব্রাহ্মণ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত সমাজ স্থাপন করা। হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিল যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা।

স্ব মর্যাদা বিবাহ

হিন্দু সমাজের প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি আড়ম্বরময়, ব্যয়বহূল। সেই পদ্ধতিতে পাত্র পাত্রীর মতামতের কোন জায়গা থাকে না। বিবাহ পরিবারের লোকেদের দ্বারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়। ধর্ম, জাতি, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই রীতি। দেওয়া নেওয়া, আদান প্রদানের এক বিশাল হিসাব তার মধ্যে। পণ প্রথার প্রচলণ ভীতিকর। ফলে কন্যা সন্তানের জন্ম থেকেছে অবাঞ্ছিত। এরই পাশাপাশি সমাজে বাল বিবাহ প্রচলিত ছিল। মেয়েদের যৌনতার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার লক্ষ্যে তাদের বাল্যকালেই বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল। এই অযৌক্তিক আড়ম্বড়ময় বিবাহ পদ্ধতি ও মেয়েদের স্বাধীনতাহীন, পরনিয়ন্ত্রিত এই জীবন পেরিয়ার মেনে নিতে পারেন নি। বিকল্পের সন্ধানে তিনি স্ব মর্যাদা বিবাহের পক্ষে দাড়ান। স্ব মর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে তার পক্ষে প্রচার চালান ও সেই ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠান সংগঠিত করায় নিজে তৎপর হন। Self Respect Marriage বা স্ব মর্যাদা বিবাহ স্ব মর্যাদা আন্দোলনের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। সেখানে বিশেষ ধরনের বিবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। এর মূল প্রতিপাদ্য ছিল পাত্র পাত্রীর পারস্পরিক সাম্য। ব্রাহ্মণ্যবাদী বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সাম্যের ধারনা অনুপস্থিত। সেখানে পাত্রীকে দান করা হয়। স্ব মর্যাদা বিবাহে পাত্রী স্ব ইচ্ছায় পাত্রকে গ্রহণ করে। এই বিবাহ পুরোহিত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি রেওয়াজ বর্জিত। এখানে বিবাহ একটি চুক্তি, ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কোন জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন নয়। চুক্তির ধারনাটার সঙ্গে চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে যা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তায় একেবারেই

গ্রহণযোগ্য নয়। পেরিয়ারের অনুপ্রেরণায় তামিলনাড়ুতে স্ব মর্যাদা বিবাহ সম্পন্ন হত ভিন্ন ভিন্ন জাতির পাত্র পাত্রীর মধ্যে, অথবা একই জাতির মধ্যে। বিধবা বিবাহও সংগঠিত হত। এর আগে, জ্যোতিরাও ফুলে তাঁর সত্যশোধক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তিত বিবাহ পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তবে তা সেই সময়ে সীমিত সাফল্য পেয়েছিল। সেই সময় মাত্র কয়েকটি ঐ ধরনের ব্যতিক্রমী বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, এবং তাও হয়েছিল সরাসরি ফুলের নিজের তত্বাবধানে। সেদিক থেকে দেখলে দেখা যায় তামিল অঞ্চলে পেরিয়ারের স্ব মর্যাদা বিবাহ চালু করার প্রচেষ্টা অনেক বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়। স্ব মর্যাদা আন্দোলনের অন্যতম এক শীর্ষ নেতা, কুঞ্চিটাম গুরুসামী দাবী করেছিলেন ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ -র মধ্যে আট হাজারেরও বেশি স্ব মর্যাদা বিবাহ তামিল নাড়ুর বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[13] স্ব মর্যাদা বিবাহ বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে তামিল নাড়ুর থাঞ্জাভূর, ত্রিচি, মাদুরাই ও রামনাথপুরম্ জেলাগুলিতে। নাডার জাতির লোকদের আগ্রহ ছিল সব থেকে বেশি। নীচু জাতির এই নাডাররা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাদের অনুষ্ঠানাদিতে আসতে রাজি হত না। ফলে যখন স্ব মর্যাদা আন্দোলন পুরোহিত বর্জনের ডাক দিল, নাডাররা খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।[14] স্ব মর্যাদা আন্দোলনের প্রভাবে কতজন পুরুষ বিধবা বিবাহ করেন তা অবশ্য সঠিক ভাবে জানা যায় না, কিন্তু পেরিয়ারের সহযোগীরা দাবী করেন সংখ্যাটা ছিল কয়েক হাজার। প্রথম স্ব মর্যাদা বিবাহ ১৯২৫-এ পালঘাটে পেরিয়ারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়েটা ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতির পাত্র পাত্রির মধ্য। পাত্র ছিল ব্রাহ্মণ, কুডি আরাসু পত্রিকার উপ সম্পাদক। পাত্রী এক দেবদাসীর মেয়ে।[15] স্ব মর্যাদা আন্দোলনের অনুষ্ঠিত বিবাহ পদ্ধতির বিশেষ তাৎপর্য ছিল এটাই যে সেখানে মেয়েদের সম অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হত, কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী বা কারো সম্ভাব্য মা হিসাবে নয়। সে কাউকে দেওয়া কারো সম্পত্তি নয়।

তবে গোড়ার দিকে এই ধরনের বিবাহের বৈধতা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ১৯৩২ থেকে বেশ কিছু স্ব মর্যাদা বিবাহ পৃথক ভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়। পরবর্তী কালে ১৯৫৫-র স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে এ গুলি বৈধতা পায়, কিন্তু সেগুলি অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করা আবশ্যক হয়। অনেক পরে, ১৯৬৭-এ তামিল নাড়ুতে ডি এম কে সরকারের আমলে আইন করে স্ব মর্যাদা বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। সে বৈধতা অবশ্য তখন শুধু তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রেই ছিল। অধিকাংশ স্ব মর্যাদা বিবাহকে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী পরিবারগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ১৯৩০-১৯৪০-র মধ্যে স্ব মর্যাদা বিবাহের প্রায় ষাট শতাংশই ছোট বড় শহরে হয়। চল্লিশ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে। ঈরোডে পেরিয়ার ভিডু-র [অর্থাৎ পেরিয়ারের বাড়ি, যেখানে তিনি জন্মে ছিলেন] কাছেই আছে কল্যাণম্ মন্ড্রম্, অর্থাৎ বিবাহ গৃহ। সেখানে আজও স্ব মর্যাদা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে সেখানে স্ব মর্যাদা বিবাহ-এর সব আয়োজন করা হয়। যথা শ'খানেক অতিথিকে আপ্পায়ন থেকে শুরু করে, বর বৌয়ের জন্য মালা, বিয়ের পোশাক ইত্যাদি সহ আবশ্যিক সামগ্রি।[16] স্ব মর্যাদা বিবাহে

আত্মীয়পরিজন ও নিমন্ত্রিতদের সামনে উপস্থিতদের মধ্যে থেকে কোন প্রবীণ ও/বা গণ্যমান্য ব্যক্তির পৌরোহিত্যে পাত্র পাত্রী পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে এবং মালা বদল হয়। এই ধরনের বিবাহকে উৎসাহ দিতে, পেরিয়ার তাঁর জীবনকালে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত থেকে পৌরহিত্য করেছিলেন।

নারী মুক্তির পথ

নারী মুক্তির লক্ষ্যে পেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূরণ পদক্ষেপ ছিল স্ব মর্যাদা বিবাহ।_নারীর প্রান্তিক সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পেরিয়ার সচেতন ছিলেন। সেই পরিস্থিতি থেকে তাদের মুক্ত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। স্ব মর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। আন্দোলনের মধ্যমে সার্বিক ভাবে লিঙ্গ ঐক্য প্রসঙ্গে প্রচার চালানো হয়। শিক্ষা, সম্পত্তি, কর্ম এবং অতি অবশ্যই পরিবার ও বিবাহ সেই প্রচারের বিষয় বস্তু ছিল। সেই সময় স্ব মর্যাদা আন্দোলনের উত্থাপন করা দাবীগুলির মধ্যে ছিল বিধবা বিবাহ, মেয়েদের বিবাহ যোগ্যতার বয়স বাড়ানো, মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার বিবাহে, ও পরিবারে সম মর্যাদা। স্ব মর্যাদা আন্দোলন দেবদাসী প্রথা ও বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করে। বাল্য বিবাহ নিষিধ করার জন্য ১৯২০-র দশকে যখন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আলাপ আলোচনা করে তখন স্ব মর্যাদা আন্দোলনের পক্ষ থেকেও সেই আলোচনায় সক্রিয় ভাবে মতাপত প্রকাশ করা হয়। আন্দোলনের এক মুখপাত্র কইভাল্যাম স্বামিয়ার প্রস্তাব রাখেন মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ষোল বছর করা হোক। তা হলে তারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারবে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পেরিয়ারের অবস্থান ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। নারীর সন্তান ধারন করা, না করা তার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। প্রসঙ্গত,_উল্লেখ করা যেতে পারে যে Child Marriage Restraint Act, 1929, যা সারদা এক্ট নামেও খ্যাত, মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ বছর রাখে। মাদ্রাজে পরবর্তিকালে জাস্টিস্ পার্টি Child_Marriage and Age of Consent Bill পাস করে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ স্থির করে। থাঞ্জাভুর ও ত্রিচি জেলাগুলিতে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণরা এই ধরনের আইনের তীব্র বিরোধিতা করে। স্ব মর্যাদা আন্দোলনের পক্ষ থেকে পেরিয়ারপন্থীরা সর্ব শক্তি দিয়ে সনাতন ব্রাহ্মণদের ঐ অবস্থান প্রতিহত করায় ব্রতী হয়। তাদের পাশে দাড়ান ডাক্তার মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী সহ প্রগতিশীল কিছু ব্রাহ্মণ নেতা। স্ব মর্যাদা আন্দোলনের দিক থেকে এর পরও এক দিকে যেমন ধারাবাহিক ভাবে বাল্য বিবাহ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাওয়া হয়, অন্য দিকে আইন যথাযথ ভাবে বলবৎ না করার অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে তোলা হয়। তামিল অঞ্চলে সমাজের প্রগতিশীল অংশের এই ধারাবাহিক প্রচারে অনেকটাই কাজ হয়। ১৯৩১-এর জনগণনার ফল থেকে দেখা যায় যে তামিল জিলাগুলিতে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অব্রাহ্মণদের মধ্যে বাল্য বিবাহের সংখ্যা অনেক কম

ছিল; ডিপ্রেসড ক্লাসেস ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশি ছিল।[17] তিরিশের দশক থেকে স্ব মর্যাদা আন্দোলন মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ নেয়। তার মধ্যে সংগঠনের পরিচালন কমিটিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ছিল অন্যতম। ১৯৩১-এ ভিরুধানগরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তেরোজন পরিচালন কমিটির সদস্যের মধ্যে দুজন মহিলা রাখা হয়। তারা ছিলেন ইন্দিরানি বালাসুব্রামানিযাম্, এস নীলাবতী। সি এন আন্নাদুরাই ১৯৩৫-এ স্ব মর্যাদা আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে ত্রিচি জেলায় থুরাইয়ুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানের জন্য বরাদ্দ ফি মেয়েদের ক্ষেত্রে মকুব করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৩০-র দশক থেকেই স্ব মর্যাদা আন্দোলন নারী বিষয়ে পুস্তক ও নিবন্ধ রচনাকে উৎসাহিত করে চলে। এর ফলে, বেশ কিছু লেখক উঠে আসেন যারা নারীর করুণ অবস্থা ও তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের কথা তাদের রচনায় তুলে ধরেন। ১৯৪৩-এ দ্রাভিডানাড়ু পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে সি এন আন্নাদুরাই-এর রচিত পার্বতী বি এ প্রকাশিত হয়। এটি একটি নায়িকা কেন্দ্রিক উপন্যাস ছিল যেখানে সুশিক্ষিতা যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন নায়িকা বলিষ্ঠ ভাবে সামাজিক মন্দ ও শোষণের বিরোধিতা করে।[18] সার্বিক ভাবে ই ভি আর ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। নারী সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যানধারণা তাঁর কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিল না। তিনি নারীর সতিত্ব ও মাতৃত্ব সম্পর্কে সামাজিক ভাবে গড়ে তোলা প্রচলিত ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান। তাঁর আলোচনায় বিবাহ বিচ্ছেদ, ভালবাসা সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পায়। নারীর এক অন্য রূপ উঠে আসে।[19] স্ত্রী নয়, মা নয়, স্বাধীন সচেতন ব্যক্তি হিসাবে সে সামনে আসে। এমন একজন ব্যক্তি যার নিজের জীবনের উপর নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। মূল স্রোতের বিপরীতে দাঁড় করানো পেরিয়ারের সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অতি র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনা পরবর্তিকালের নারীবাদী চিন্তা চেতনারই যেন পূর্বসূরি।

এক যুক্তিবাদী, ধর্ম বিশ্বাসহীন সমাজ গঠনের প্রয়াস

এক দিক থেকে পেরিয়ার যেমন নারীবাদের পূর্বসূরি ছিলেন, অন্য দিক থেকে তিনি একজন প্রকৃত যুক্তিবাদী ছিলেন। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তা তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। যুক্তিবাদ দীর্ঘ কালের দর্শনের একটি ধারা। যুক্তিবাদীরা বিশ্বাস করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর, মানুষের সচেতন, যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস থেকে শুরু করে ডেস্কারটেস, স্পিনোজা, হবস্, লক, রুশো, ভল্টেয়ার, কান্ট সবাই এই চিন্তার ধারার প্রতি নিজেদের মত করে অবদান রেখে যান। তাঁরা কেউই ভগবান বা আত্মার অবিনশ্বরতার উপর আস্থা রাখেন নি যেমন রাখেন নি ডারউইন্,, মার্ক্স বা নিৎশে। পেরিয়ার সেই ধারারই চিন্তাবিদ। ভগবানের ধারনাকে জোরালো ভাষায় অস্বীকার করে যুক্তিবাদী পেরিয়ার নাস্তিকতার পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি জনসভায় তাঁর ভাষণ শুরুই করতেন ভগবানের সমালোচনা দিয়ে। বলতেন, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। বলতেন, কোন ভগবান নেই, কোন ভগবান নেই, কোন ভগবান নেই একেবারে। যে ভগবানকে সৃষ্টি করেছিল সে নির্বোধ, যে

ভগবানের প্রচার করে সে বদমায়েস, যে উপাসনা করে সে বর্বর। তাঁর ঈশ্বর সমালচনায় পেরিয়ার শুধু আবেগ ব্যবহার করেন এমনটা নয়, যুক্তি দিয়ে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ধর্ম আমাদের মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দেয়, প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে ধ্বংস করে, আমাদের সমৃদ্ধি বিপন্ন করে, অগ্রগতিতে বাধা দেয়। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, আচার আচরণ, উৎসব পালনে বিপুল ব্যয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন সেগুলি শুধু অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন নয়, উৎপাদনকেও ব্যহত করে কারণ ধর্ম বিশ্বাসের ফলে মানুষ যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তের বদলে রীতি রেওয়াজকে প্রাধান্য দেয়। ধর্মের সমালোচনা পেরিয়ারের স্ব মর্যাদ আন্দোলনে ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে মতামতের কতগুলি প্রধান দিক ছিল।

এক, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সমালোচনা;

দুই, ধর্ম গ্রন্থগুলির সমালোচনা;

তিন, ধর্মীয় জীবন দর্শনের সমালোচনা;

চার, ধর্মীয় রীতিনীতির সমালোচনা।

এই সব কিছুকে যুক্ত করে তিনি সার্বিক ভাবে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সাহসের সঙ্গে নাস্তিকতার প্রচার চালান। পেরিয়ারের মূল আক্রমণের লক্ষ ছিল হিন্দু ধর্ম। তিনি বলেন ঐ ধর্মকে আদৌ ধর্ম বলা চলে না। তার কারণ, ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক, হিন্দু ধর্মের তা নেই। ধর্ম গ্রন্থগুলি ধর্মীয় নয়, অবাস্তব, অযৌক্তিক; হিন্দু দেবতাদের, গ্রিক রোমান দেবতাদের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে; এই দেবতাদের কার্যকলাপ ,যা ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি অনৈতিক অশ্লীল; হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে অশ্লীলতা, অবাস্তবতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পায়; হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি আত্মা, কর্ম, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি ধারনাগুলি কাল্পনিক ও বোকা। এই হিন্দু ধর্ম অন্তত তামিল অঞ্চলের সহজাত ধর্ম নয় বলে পেরিয়ার মনে করেন। তিনি বলেন আর্যরা যখন ঐ অঞ্চলে আসে তখন তারা ওখানের মানুষ জনকে নিজেদের অধীনে আনার লক্ষ্যে হিন্দু ধর্ম চাপিয়ে দেয়। প্রমান হিসাবে বলেন, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের রীতি রেওয়াজের কোন উল্লেখ নেই। পেরিয়ার শুধু হিন্দু ধর্মের সমালচনা করেন এমনটা নয়। অন্যান্য ধর্মের সমালচনা করেন। ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মকে বাদ দেন নি। তবে সব থেকে বেশি আক্রমণ করেন হিন্দু ধর্মকে। ১৯৫৩-তে পেরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় গনেশের মূর্তি ভাঙ্গার আন্দোলন করেন। বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ মনুস্মৃতি এবং রামায়ণ পোড়ানোর আন্দোলনও করেন। ১৯৫৫-য় রামের মূর্তি পোড়ানোর চেষ্টা করায় তিনি গ্রেপ্তারও হন। বিবাহ, পূজা পেরিয়ার ধর্মিয় আচার অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার হিসাবে চিহ্নিত করেন। জন্ম, মৃত্যু,পার্বন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে সব অনুষ্ঠানাদি হত সেগুলি স্ব মর্যাদা আন্দোলনের সমালোচনার মুখে পড়ত। পাশাপাশি,আত্মা, পরজন্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ভূত প্রেত, ইত্যাদির ধারণাকে মানুষের অজ্ঞতা ও দাসত্বের জন্য দায়ি বলে মনে করা হত।

উপসংহার

পেরিয়ার চুরানব্বই বছর বয়সে ১৯৭৩-র ২৪শে ডিসেম্বর মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি কাঠামো ভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত লড়াই জারি রাখেন। তিনি তাঁর নানা আন্দোলন, অসংখ্য লেখা আর ভাষণের মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করে যান। সেগুলিতে তিনি যুক্তিবাদের কথা বলেন, প্রান্তিক মানুষের মুক্তির কথা বলেন, নারী স্বাধীনতার কথা বলেন। একটা বড় অভিজাত, মধ্যবিত্ত শহরকেন্দ্রিক সমর্থনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে পেরিয়ারের নেতৃত্বে স্ব মর্যাদা আন্দোলন ১৯৩০-৪০-এর দশকে শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল তামিল সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন, ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎখাত, জাতি ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপ নারী ও শূদ্রদের মুক্তি এবং ধর্ম ও কুসংস্কারকে নির্মূল করে, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। তামিল নাড়ুতে পেরিয়ারের এবং তাঁর আন্দোলনের প্রভাব আজও বর্তমান। পেরিয়ারের নামে রয়েছে বহু রাস্তা, বাড়ি ও সৌধ; অলিতে গলিতে দেখা যায় পেরিয়ারের মূর্তি যার পাদদেশে লেখা পেরিয়ারের বৈপ্লবিক বাণী। সামাজিক, রাজনৈতিক লড়াইয়ে ঘুরে ফিরে উঠে আসে পেরিয়ারের নাম। সে নাম সেখানে সবার কাছে পরিচিত। কারো কাছে তাঁর নাম রাগের উদ্রেক ঘটায়, কারো কাছে শ্রদ্ধার। সব প্রতিক্রিয়াই আবার সম্পর্কিত থাকে সেখানের জাতিগত, সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমির সঙ্গে। এই নিবন্ধে পেরিয়ারের রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তাঁর রাজনীতির নানা দিক আলোচনার বাইরে রাখা হয়। শুধু সেটুকুই আলোচনায় আনা হয়েছে যেটুকু সামাজিক ভাবে প্রান্তিক মানুষের স্ব মর্যাদার জন্য তাঁর লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রাসাঙ্গিক লেগেছে।

তথ্যসূত্রঃ

---

[1] দেবী চ্যাটার্জী, ২০১০. আইডিয়াস অ্যান্ড মুভমেন্টস আগেন্সট কাস্ট ইন ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লিঃ অভিজীত পাবলিকেশনস।

[2]বিএস চন্দ্রবাবু, ১৯৯৩. সোশ্যাল প্রটেস্ট ইন তামিল নাড়ু: উইথ রেফারেন্স টু সেলফ রেস্পেক্ট মুভমেন্ট (ফ্রম ১৯২০স টু ১৯৪০স} মাদ্রাজঃ এমারেল্ড পাবলিশার্স, পৃ ১৭।

[3] ঐ।

[4] ঐ পৃ ১৮-১৯ ।

[5] দেবী চ্যাটার্জী, জয়পুরঃ রাওয়াত পাবলিকেশনস, পৃ ৫৫ ।

[6] এম ডি গোপাল কৃষনন্ ১৯৯৬. পেরিয়ার: ফাদার অফ দি তামিল রেস, চেন্নাই: এমারেল্ড পাবলিশার্স, পৃ ৭ ।

[7] বি এস চন্দ্রবাবু, ঐ।

[8] এস সরস্বথী ১৯৯৪. টুওয়ার্ল্ড সেলফ রেস্পেকটঃ পেরিয়ার ই ভি আর অন অ্যা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার,

মাদ্রাজঃ ইন্সটিটিউট অফ সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাডিস, পৃ ৩৬-৩৭ ।

[9] এ সা বিশ্বনাথন,১৯৮৩ । দি পলিটিকাল কেরিয়ার অফ ইভি রামসামী নাইকার, মাদ্রাজঃ রবি অ্যান্ড বসন্ত পাবলিশার্স পৃ ৪০-৪১ ।

[10] বি এস চন্দ্রবাবু, ঐ, পৃ ৩৩-৩৬ ।

[11] ভি গীথা ও এস ভি রাজাডুরাই, ১৯৯৮. টুওয়ার্ট্স অ্যা নন ব্রাহ্মিণ মিলেনিয়ামঃ ফ্রম যাইওথী থাস টু পেরিয়ার, কলকাতা, সাম্য, পৃ ১২৮- ২৯ ।

[12] এম ডি গোপাল কৃষনন, পৃ ২২-২৪।

[13] এ সা বিশ্বনাথন, ঐ,পৃ ৯৯ ।

[14] বি এস চন্দ্রবাবু, ঐ,পৃ ১০৩ ।

[15] ঐ, পৃ ৯৬ ।

[16] লেখকের নিজের ক্ষেত্র সমীক্ষা।

[17] বিএস চন্দ্রবাবু, ঐ পৃ ১১১-১১২ ।

[18] বিএস চন্দ্রবাবু, পৃ ১২১-২ ।

[19] ভি আনাইমুথু সঙ্কলিত, ১৯৭৪ । পেরিয়ার ই ভে রা চিন্তনৈগল, খন্ড ১, ত্রিচিঃ থিংকার্স ফোরাম, পৃ ১০৫- ১৭৮ ।